রম্য
রচনা

একটি গামলা আনিবা

কুমকুম সমাদ্দার
এফই- ২৪৮

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ গুণ ছিল। এই বিশেষ গুণটির জন্য আত্মীয় মহলে তাঁর খাতির ছিল খুব—বিশেষ করে মহিলা মহলে। এ আর এমনকি নতুন কথা? সাহিত্যিক মানুষ—তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনার জন্য এমনটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। আসলে ব্যাপারটা তা নয়—তাঁর সাহিত্য প্রতিভার কথাই হচ্ছে না এখানে। তবে কি তাঁর পড়ানো? আরে দূর-আত্মীয় স্বজনেরা তাঁর 'কেলাসের ছাত্তর' নাকি? তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্ট পটলডাঙার সেই বিখ্যাত চার মূর্তিমান টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল, প্যালার হাসির ঝড়তোলা সব কীর্তি-কাহিনী? আরে না না, তাঁর লেখালেখির কথাই হচ্ছে না এখানে তবে যদিও সে একরকম লেখালিখিই বটে! তবে একটু অন্যরকম।

আসল কথাটা হচ্ছে, একটা পোস্টকার্ডের মধ্যে খুদে খুদে অক্ষরে তিনি সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কথা ঠেসে দিতে পারতেন—গয়নার নৌকায় যেমন করে যাত্রী ঠাসে। চিৎ হয়ে শুলে যা ভাড়া, পাশ ফিরে শুলে তার অর্ধেক। তাঁর এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় পরিজনেরা মুগ্ধ এবং তাঁর এই গুণটিকে কাজে লাগাতে তাঁদের আগ্রহের কোন ঘাটতি ছিল না। প্রয়োজনীয় এবং তার চেয়ে বেশি অপ্রয়োজনীয় বার্তার শেষে হয়ত লিখতে হত—'পূজায় বাড়ি আসিবার সময় একখানা গামলা আনিবা।' তাঁর এই পোস্টকার্ড-বাহিত গামলা-সাহিত্য কতকাল চলেছিল জানা নেই তবে দূর দেশ থেকে কেউ আসছে শুনলে গামলা না হোক কোন কিছু 'আনিবা-সাহিত্য' এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আড়মোড়া ভেঙে জানান দেয় 'সে এখনো মরে নাই'। কি আনিবা, কেন আনিবা, কাহার লাগিয়া আনিবা এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন ব্যাকরণ নেই। পিঁপড়ের ডিম, মিষ্টি দই-এর হাঁড়ি, ইলিশ মাছ, জ্যান্ত কই থেকে জ্যান্ত মানুষ পর্যন্ত! কি নয়?

আমেরিকাবাসী এক বঙ্গ ললনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন এক সাহেব। সব প্রেমের যা শেষ পরিণতি অর্থাৎ বিয়েতে এসে ঠেকে গেছেন দু'জনে। পাত্রী যদিও মা, বাবা, হ্যাঁ, নার বেশি বাংলা বলতে গেলে সাতবার হোঁচট খায়, তবুও বাঙালি বলে কথা! মা, বাবা, মাসি, পিসিদের সখ বিয়েটা পুরোপুরি বাঙালীদের মত করেই হবে। সুতরাং শাড়ী, গয়না, ধুতি, পাঞ্জাবী, কুলোডালার ধূম! সম্ভব হলে কলাপাতা খুরিও বাদ পড়ত না। সাহেব বরকে ধুতি, পাঞ্জাবী মালা, টোপর পরানো হবে। হাতে দর্পণও থাকবে। কানের পাশে শোলার কদম ফুল দোলান টোপর মাথায় বাঙালী বরেরা কেমন দেখতে হয়, সে ছবিও তাকে দেখানো হয়েছে। সবেতেই মৃদু হাসিতে তার সানন্দ সম্মতি—নতুনত্ব, কালচার, fun! কলকাতা থেকে কনের মাসি সবই বাক্সবন্দি করে নিয়ে যাবেন। বরণডালা-কুলো সব। পঞ্চগব্যের গোময় গোমুত্রও চিমটি পরিমাণে ম্যানেজ হয়ে যাবে। ম্যানেজ হয়ে যাবে কনের মুকুটও। গোল বাধাচ্ছে কেবল 'একখানা টোপর আনিবা।' স্যুটকেসে ঠাসলে সেখানে চেপ্‌টে গিয়ে থ্রি থেকে টু-ডায়মেনশনাল হয়ে আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ফেঁসে যাবে। তাহলে উপায়? বরের মাথায় টোপর না থাকলে বিয়েটাই তো আলুনি লাগবে। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে নির্দেশ এল—কি আর করা! টোপরখানা বরং হাতে করেই 'লইয়া আসিবা'। এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না।

প্রস্তাবটা শুনে কনের মেসো গরম তেলে ফোঁড়ন পড়ার মত ঠিকরে উঠলেন—

—বিয়ে বিয়ে করে তোমরা সব ক্ষেপে গেলে নাকি? কি বলছ একবার সেটা ভেবে দেখেছ? স্ট্রোলি, হ্যাণ্ডব্যাগ, ল্যাপটপ, পাসপোর্ট এসব

সামলাতে গিয়ে নিজেই হিমসিম—তারপর আছ তুমি! এর মধ্যে টোপর আসছে কোত্থেকে?

—তা বললে চলবে? টোপর তো নিতেই হবে। কি করে নেবে সেটা তোমার ব্যাপার।

—তোমার ব্যাপার বললেই হ'ল? সেই কোনকালে সার্কাসের ক্লাউনের মত শোলার টোপরটা মাথায় পরতে অস্বস্তি হ'ত বলে মাঝে মাঝে হাতে নিয়ে নিতাম, তাই বলে এই বুড়ো বয়সে আবার? আর নেবই বা কোনহাতে শুনি?

—তা হাত জোড়া থাকলে তখন কিছুক্ষণের জন্য মাথায় পরে নিলে অসুবিধেটা কোথায়? এয়ারপোর্টে কতদেশের লোক কতরকম টুপিটাপা মাথায় পরে। ওদেশে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই কারো, কেউ ফিরেও তাকায় না।

—কি বলছো যা তা। তোমার বোনঝির বিয়ে আর টোপর পরব আমি? এত বড় জার্নিটায় শার্ট প্যান্টের সাথে কানের পাশে শোলার বল দুলিয়ে টোপর পরে বসে থাকতে হবে? আমাকে কি সত্যিকারের ক্লাউন না বানিয়ে ছাড়বে না তোমরা? কি পেয়েছ আমাকে?

কনের মেসো ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

—আহা চটছো কেন? সবসময় পরতে কে বলছে? দরকার হলে বলছিলাম আর কি! আর এছাড়া উপায় কি বলো? মেসো হয়ে এটুকুও করতে পারবে না? একটু টোপরই পরলে না হয়। বিয়ে তো আর করতে বলছে না কেউ।

—That is the only brighter side of wearing a টোপর again! এর পরের কাহিনীতে ক্রিয়াপদের মুখটা একশ আশি ডিগ্রী ঘোরানো। কিছু 'আনিবা নয়, লইয়া যাইবা'।

দিন কয়েকের জন্য মফঃস্বলের বাড়িতে গিয়েছিল বুটাই। কলকাতায় ফিরবার সময় মায়ের অনুরোধ,

—গাছে এত কাঁঠাল! গড়াগড়ি যাচ্ছে—খাবার লোক নেই। অথচ কলকাতায় পাঠাবার লোক পাচ্ছি না। পিন্টুটা এত কাঁঠাল ভালবাসে! বুটাই, লক্ষ্মী বাপ আমার! ওর জন্য একটা কাঁঠাল নিয়ে যা না বাবা। বাংকে তুলে দিস। সকালে ট্রেন পৌঁছালে কুলির মাথায় চাপিয়ে দিবি কোন অসুবিধে হবে না। আর হ্যাঁ, আধ বস্তা নারকোল আর পেয়ারাও সঙ্গে দিচ্ছি। দাশু, সদানন্দ, সন্ধ্যা, শিউলী, শিবু, ছুট্‌কী সবার বাড়ি একখানা করে ঝুনো নারকোল আর গোটা দশেক করে পেয়ারা পৌঁছে দিস। আর চালকুমড়ো পাতাকখানা দাশুর বাড়ি। দাশু নাকি অনেককাল চালকুমড়ো পাতা মোড়া চিংড়ির বড়া খায় না। কলকাতায় নাকি চালকুমড়ো পাতা পাওয়া যায় না?

চালকুমড়ো পাতার সুলুকসন্ধানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বুটাই-এর মুখের ম্যাপখানা তখন ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত। নাঃ তেমন অসুবিধে আর কোথায়? নারকোল পেয়ারা ঘাড়ে করে সল্টলেক থেকে কাঁকুড়গাছি হয়ে বেহালা বাঁশদ্রোণী ঘুরে কেয়াতলা ক্যাওড়াতলা ডিঙিয়ে গোবর ডাঙায় পৌঁছাতে পারলেই মোটামুটি কাজ শেষ। কি আর এমন? কলকাতা শহরে ট্রাম বাসের তো আর আকাল পড়েনি! আর উঠতি বয়সের ছেলেরা একটু ছুটোছুটি করবে না তো করবে কে?

ট্রেন চলেছে। ট্রেন চলার ছন্দে ছন্দে আনন্দে দুলতে দুলতে বুটাই আর হেবো দিব্যি লুচি-আলুর ছেঁচকি সাঁটাচ্ছে। লুচি চিবোতে চিবোতে মাঝে মাঝে আপন থেকেই দৃষ্টি চলে যাচ্ছে উল্টোদিকের বাংকে রাখা নারকোল, পেয়ারার বস্তা আর তাকিয়া প্রমাণ কাঁঠালটির দিকে। পেয়ারা-নারকোল সামান্য নড়াচড়া করলেও মোটামুটি স্থিতাবস্থায়। কিন্তু কাঁঠালটার গতিক-সতিক খুব সুবিধের ঠেকছে না। ট্রেনের দুলুনির সাথে তাল দিয়ে বড্ড বেশি গড়াগড়ি খাচ্ছে। এত ওজন, তার গায়ে কাঁটা, তবুও কেন যে এত বিপদজনক গড়াগড়ি! খালি সামনের দিকে গড়িয়ে আসতে চায়। নিজের সঠিক অবস্থানটা বুঝিয়ে দিতে বেশ কয়েকবার ঠ্যালা গুঁতোও খেয়েছে। কাঁঠালটার ঠিক নীচে একজন ঝাঁটাগুঁফো যাত্রী বসে। চক্‌চকে মসৃণ টাকখানা আয়নার মত ল্যাকার-পলিস্-ফিনিস্। ওপরের ট্যাঙ্ক জলশূন্য হলেও নীচের ট্যাঙ্ক ভর্তি! 'হেড অফিসের বড় বাবু'র মত বেশ জমকালো একজোড়া ঘন কালো গোঁফ! গোঁফের গোড়ার দিকগুলো আবার সাদা-বোঝাই যাচ্ছে অনেক যত্ন সহকারে রঙ করা। সঙ্গের ঝোলাটি

থেকে মাঝে মাঝেই এটা সেটা কি সব বার করে মুখে ফেলছেন আর চিবোচ্ছেন। চিবোতে চিবোতে বারে বারে গোঁফে হাত বুলোচ্ছেন।

এতক্ষণ সব ঠিকঠাকই চলছিল। একটা স্টেশনে ট্রেনটা আচমকা একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই ঘটে গেল বেসামাল কাণ্ডটা। Inertia of Motion এর থিওরিটা যে এমন চোখের সামনে Practical হয়ে চোখে আঙুল দিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দেবে কে জানত! Inertia of Motion এর ধাক্কায় কাঁঠালখানা গদিচ্যুত হয়ে সামনে এসে পড়বি তো পড় এক্কেবারে সেই ঝ্যাঁটাগুঁফোর টাকে! পাকা কাঁঠালটার রস টুসটুসে কোয়াগুলো ছড়রাগুলি মত ছিট্‌কে এর চাদরে, তার খোঁপায়, ওর চায়ের ভাঁড়ে, কারো দাড়িতে, কোলে পিঠে সর্বত্র! ভদ্রলোকের টাক, মুখ, গোঁফ কাঁঠালের রসে রসাপ্লুত!

ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেলেও হেবো আর বুটাই মুখের চোর চোর ভাবখানা চেপে প্রাণপণ স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় অস্বাভাবিক! দুজনেই নির্বাক দর্শক!

এমন একখানা কাণ্ডে কিছু বলতে না পেরে হেবোর পেট গুড়গুড়! আর থাকতে না পেরে বুটাই-এর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল,

—বুটাইদা! একেই কি বাংলায় বলে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া?

—অ্যাই! চুপ্! একদম চুপ্। আর একটা কথা বললে তোকেও কাঁঠালের অবস্থা করে ছেড়ে দেব। জোর গাঁট্টা খাবার শখ হয়েছে বুঝি?

গুঁফো ভদ্রলোক গোঁফে লেগে থাকা কাঁঠালের রসটুকু জিভ দিয়ে কায়দা করতে করতে পরিস্থিতিটা সামলে উঠেছেন। থেঁতলানো কাঁঠালটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে আলুচেরা গোল গোল রক্তচক্ষু পাকিয়ে হেবো, বুটাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—এই কাঁঠালটা কার?

হেবো, বুটাই কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

ভদ্রলোক আরেক কিস্তি হুঙ্কার ছাড়লেন,

—এটা কোন বেআক্কেলের কাঁঠাল? জানতে পারলে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবার শখটা জন্মের মত ঘুচিয়ে দিই!

কম্পার্টমেন্টের সব জোড়া চোখ হেবো, বুটাইয়ের দিকে। হেবো, বুটাই জানলা দিয়ে উদাস নয়নে প্রকৃতি দেখায় মগ্ন! গলার জল কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। কাঁঠাল বেওয়ারিস। ওদের কি করার আছে? আরো বার কতক হুঙ্কার ছেড়ে, কত দাবীদার না পাওয়ার প্রচণ্ড রাগে ভদ্রলোক ট্রেনের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কাঁঠালটা। বুটাই, হেবোর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

সব দুঃখেরই শেষ আছে। ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকল। নারকোল পেয়ারার বস্তা নিয়ে নেমে পড়ল দু'জনে। তবে বিপদ নাকি কখনো আবার একা আসে না। এক ঠ্যালাওয়ালার ঠ্যালা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা লোহার খোঁচায় পেয়ারার বস্তায় বিশাল ফুটো। এর পরের দৃশ্য—সারা প্ল্যাটফর্মময় খান পঞ্চাশেক পেয়ারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর সেগুলোকে পাকড়াও করতে পেছন পেছন ছুটছে শ্রীমান বুটাই এবং হেবো।

কাঁঠাল, নারকোল, পেয়ারা কাণ্ডের পরে বুটাই একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কারো অনুরোধেই ও আর ঢেঁকি গিলবে না। এই 'লইয়া যাইবা বা এটা আনিবা, সেটা আনিবার মধ্যে ও আর নেই। ওকে সবাই পেয়ে বসেছে। অনেক হয়েছে। আর না! ন্যাড়া বেলতলাতে আর যাচ্ছে না।'

কিন্তু বুটাই ন্যাড়ার ব্যাপারে সুকুমার রায়ের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল—''লাখোবার যায় যদি সে, যাওয়া তার ঠেকায় কিসে'' আর সেটাই ঘটে গেল আবার। আবার ন্যাড়া গিয়ে পড়ল বেলতলায়—আবার এক যাচ্ছে তাই কাণ্ডে! আরেক নতুন কাহিনীতে।

একটা চিঠি এসেছে বুটাইয়ের কাছে—'গৃহকর্মের বড়ই অসুবিধা হইতেছে। তোমার বসিরহাটের রাঙামাসীমা তো একটি গৃহকর্ম করিবার লোকের কথা বলিতেছিল। তোমার একান্ত অসুবিধা না হইলে একটু কষ্ট করিয়া যদি বসিরহাট হইতে উহাকে লইয়া আসিয়া এখানে পৌঁছাইয়া দাও, তাহা হইলে খুব ভাল হয়।' একটু ভাবল বুটাই। এই 'লইয়া আসিবা'টাতে মনে হচ্ছে ঝঞ্ঝাটের পার্সেন্টেজটা অনেক কম—পাকা কাঁঠাল নারকোলের বস্তা থেকে তো বটেই। একটা মানুষকে নিয়ে এসে ট্রেনে করে

পৌঁছে দেওয়া। এ আর এমন কি?

সুতরাং সুখ দুঃখের চির দোসর হেবোকে সঙ্গে করে বুটাই একদা বসিরহাটের রাঙামাসীর সন্নিধানে! ওদের দেখামাত্র রাঙামাসী তাঁর সি-সার্প কণ্ঠের স্কেলটা আরেকটু চড়িয়ে কলকল করে উঠলেন,

—আরে তরা এতক্ষণে আইলি? অল্পের লেইগ্যা দ্যাহা অইল না। তারকদাসী তগ লেইগ্যা এতক্ষণ বইয়া আছিল। এইমাত্র ভিক্ষায় বাইরইয়া গ্যালো। ভিক্ষা না করলে খাইব কি?

বুটাই পাথরের মূর্তির মত উঠোনে দাঁড়িয়ে। রাঙামাসী বলে কি? শেষ পর্যন্ত একটা ভিকিরিকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার জন্য ওদের এত দূর টেনে এনেছে? রাগে বুটাই-এর সদ্য ছাটা চুলগুলো দাঁড়িয়ে পড়ছে। রাঙামাসী কলকল করেই চলেছে।

—অহন কহন ফিরে দ্যাখ্। ভিক্ষারও নাকি আইজকাল খুব আকাল। খাট্‌নি পোষায় না। আমারে কইছিল লাগাবান্ধা একখান বাসার চাকরী পাইলে অর সুবিধা অয়। তহন ধনদির কথা মনে অইল। ধনদিরও লোকের খুব দরকার। তারকদাসীর তিনকূলে কেউ নাই। তাই কোনো পিছুটানও নাই। দ্যাশে যাওনের নাম কইরা বারে বারে ছুটিও লইব না। ভাইবা দেখ লাম ধনদির পক্ষে এইরকম লোকই ভালা। অরে কইতেই এক কথায় রাজী। হোক ভিকারী। ধুইয়া মুইছ্যা নিলেই হইব। আর হ্যাঁ, ভাল কথা—যাওনের সময় মনে কইরা 'মাঙ্কি ব্র্যাণ্ড লাল দন্ত মঞ্জন', চুলের এক শিশি নাইরকল ত্যাল, গায়ে মাখার লাইফ বয় সাবান, কাপড় ধোয়ার গুঁড়া সাবান আর একখান উকুন মারা অষুধও সঙ্গে লইয়া যাইস্। তারকদাসীরে ঘরে ঢুকানের আগে এইগুলি দরকার হইব। ও হ্যাঁ, শ্যাম্পুর পাতাও কয়েকখান নিতে ভুলিস না।

রাঙামাসী একটু দম নিলেন। তারপর বললেন,

—তরা অহন খাইয়া লইয়া একটু গড়াইয়া ল। তারকদাসী ফিরলে পরে লইয়া যাইস্। আরেকখান কথা। ও কিন্তু নিত্য পেটরুগী। সঙ্গে কিছু প্যাটের অষুধও রাখিস। কওন তো যায় না, পথে ঘাটে কহন আবার প্যাটে মোচড় দেয়।

বুটাই, হেবো খেয়ে উঠতে না উঠতে সদর দরজার কাছে কচি, ডাঁসা, পাকা কণ্ঠের উল্লাসধ্বনি,

—এসেছে, এসেছে! তারকদাসী এসে গেছে।

—মাথায় কাকের বাসা কাঁচা পাকা চুল, পরনে শতচ্ছিন্ন ময়লা ন্যাকড়া, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, বোঁচা নাকে রসকলি, বগলে ময়লা পুঁটুলী, হাতে তোবড়ানো ক্রাউনমার্কা অ্যালিউমিনিয়ামের বাটি, তারকদাসী কাদামাখা ফুটিফাটা পায়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে। মুখে একগাল হাসি। হাসির ফাঁকে পাকা ধুঁধুলের বীচির মত কালো কালো ক্ষয়ে যাওয়া খান পাঁচ ছয় দাঁত দেখা যাচ্ছে! এমন দাঁত দেখলে কবিকে আর 'দন্তরুচি কৌমুদী' টৌমুদী লিখতে হ'ত না। তালপাতা-লেখনি ফেলে চোঁচা দৌড়!

হেবো, বুটাই-এর পা দু'টো কে যেন স্ক্রু দিয়ে মাটির সাথে এঁটে দিয়েছে! মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না! এই জ্যান্ত চিড়িয়াখানা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হবে এখন! পথে চেনা কারো সাথে যদি দেখা হয়ে যায়, তখন? প্রেস্টিজের বেলুন তো পুরো পাংচার হয়ে যাবে! রাগে বুটাই-এর নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে যাকে সামনে পায়, তাকেই কয়েক ঘা কষিয়ে দেয়। কেন, মরতে ওসব 'আনিবায়' রাজী হয়ে, নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারে? বার বার!

রাঙা মাসীমা বুটাই-এর মুখের চেহারা দেখে ব্যাপার বুঝে তারকদাসীকে বললেন,

—অ তারক! তোমারে এই সাবানখান দিতে আছি। ভাল কইরা হাত মুখ ধুইয়া আমার এই শাড়ী, সায়া, ব্লাউজখান পইরা লও। পুরানো চটিটাও দিতে আছি। এইবার দুর্গা দুর্গা কইরা রওনা হইয়া পর।

এর পরের কাহিনী—হেবো বুটাই শেষ পর্যন্ত তারকদাসীকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিল এবং তার অসংখ্য গুণাবলীর জন্য পত্রপাঠ তাকে আবার বসিরহাটে ফিরিয়েও আনতে হয়েছিল।

আজকাল বুটাইকে কেউ আর কোন কিছু 'আনিবা' বা 'লইয়া যাইবা' বলতে সাহস পায় না।

অমলাকান্তের নজরদারি

শুভ্রা রায় চৌধুরী
এফই- ৩৫২

হে পোঁটলা, তুমি মানব জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয় তা তুমি বোঝ কি ? তুমি নানান সময়ে নানান আকারে নানান উপায়ে মানব জাতির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ, তাদের তোমার উদারতায়, সহযোগিতায় কত সমৃদ্ধ করেছ তা জান কি ? তাই অমলাকান্ত তোমাকে হাজারো সেলাম জানাচ্ছে।

মনে কোরোনা অমলাকান্ত নেশায় বুঁদ হয়ে বলছে। না, তিনি সজ্ঞানে তোমার আদি অন্ত মর্তবাসীকে জানিয়ে নরকুলের দেনা (তোমার কাছে আর কি) শোধ করছে।

আজ তুমি কত রঙে বেরঙে কত যান্ত্রিক আবিস্কারের ফসলে নিজেকে সজ্জিত করেছ। চ্যাপ্টা, চৌকো ছোট, বড়, ঢাউস ভারী, হাল্কা কতভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেছ। কিন্তু আদতে তোমার জন্মলগ্নে তোমার কি চেহারা ছিল তা কি তোমার মনে আছে ? তবে শোন তোমার বিবর্তনের ইতিহাস।

আসলে জন্মলগ্নে তুমি ছিলে পুরানো কাপড়ের একটি পোঁটলা বা তল্পি। অবশ্যই মানবকুলের ব্যবহার করা পরিধেয় বস্ত্র দিয়েই তোমার সৃষ্টি হয়েছিল। বস্ত্রখন্ডটি বর্গক্ষেত্রের মত কেটে নেওয়া হত এবং তার ভিতরে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে খন্ডটির চারটি কোনা বা খুঁট কোনাকুনি ভাবে বেঁধে দেওয়া হত। ফলে তোমার চেহারা দাঁড়াত একটি গোলাকার বস্তুর মত। সেটি মস্তকে বা বাহুতে অনায়াসে ধারণ করা যেত। একটু বড় আকার হলে নাম হোত পোঁটলা আর ছোটখাট হলে নাম হোত পুঁটলি। আদর করে তোমাকে তল্পিতল্পাও বলা হোত। আবার বোঁচকা বুঁচকিও বলা হোত।

মানব জাতি বড়ই অসহিষ্ণু এবং অস্থির প্রকৃতির প্রজাতি। তাই মাঝে মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে। সেই বহু বহু পুরানো জমানাতেই সে তোমাকে নিয়ে যাতায়াত করত। এইভাবে ব্যবহার হতে হতে তুমি প্রায়শই ফেঁসে যেতে এবং আচমকা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে।

নরকুল এই সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে আবিস্কার করল টিন, লোহা, এ্যালমুনিয়াম নামক ধাতুর আধার যা দিয়ে পোঁটলার কাজ হবে। তৈরি হল ট্রাংক, তোরঙ্গ ও প্যাঁটরা। প্যাঁটরা যার পোশাকি নাম পেটিকা। সাধারনত কাঠের তৈরি হত। নানা ফুল কাটা নকশা থাকত তাতে। ট্রাংক, তোরঙ্গ, শক্ত, ভারী, মজবুত হোত খুবই। টিনের ছোট ছোট ট্রাংকের উপরে পদ্মফুলের গোলাপ ফুলের সুন্দর রঙ্গিন ছবি আঁকা থকত। সব গুলোতেই তালাচাবির ব্যবস্থা থাকত। এদের উদরে জিনিষপত্র ভরে দিয়ে মোট বাহকের মাথায় চাপিয়ে মানবকুল তার যাত্রা পথের সঙ্গী করল। কিন্তু ওজন বেশি হয়ে যাওয়ায় তাতেও অসুবিধা হতে থাকল।

হে পোঁটলা তুমি একবার ইতিহাসের দিকে তাকাও। মনে কর হিউ-এন-সং এর ছবিটি । হিউ-এন-সং সুদূর চিন দেশ থেকে ভারতে পদব্রজে পর্যটন করেছিলেন। সঙ্গে ছিল নরকুলের পথেরসাথী একব্যাগ। ছোট থেকে বড়র নাম ন্যাপ, হ্যাভার-রূক, স্যাক।

তখন জন্ম হল চামড়ার সুটকেসের। তবু এখানেই ইতি হলো না তোমাকে কাটা ছেঁড়া করার। বিজ্ঞানীরা নিয়ে আসলেন রেক্সিন, মোল্ডেড ফাইবার, সষ্ট ফাইবার। আরো এক ধরনের নরম তুলতুলে চামড়া মেশানো রেক্সিন

ও ব্যবহার হতে শুরু করল।

প্রথমে যে সুটকেস জন্মালো তাতে গা-বোতাম ছাড়াও আলাদা তালা চাবির ব্যবস্থা ছিল। গা, বোতাম অনেকটা আলিবাবা গল্পের চিচিংফাঁকের মত। বুড়ো আঙুল একটু জোরে টিপলেই ফটাস করে ওপরের ডালাটা খুলে যেত। আবার ডালাটা নামিয়ে দিয়ে ঐ ভাবে চাপ দিলেই সুটকেস বন্ধ হয়ে যেত। অমলাকান্তের খুব প্রিয় ছিল এই ফটাস করে খোলা ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টা।

এরপর এল রেক্সিন। খুবই দর্শনধারী, চটকদারী। কিন্তু চামড়ার তুলনায় কিছুটা কমজোরী। সামান্য আঘাতেই চিরে ছড়ে ফাঁক হয়ে যেত। তারপর এল মোল্ডেড ফাইবার। তুমি খুশিতে ঝলমল করে উঠলে। কত আকার, কত রঙ, সারা শরীরে চেনের কত বাহার। আচ্ছা এত মনোহরণের মধ্যেও এই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকায় তোমার কি কষ্ট হোত ?

তোমার কষ্টের আসান করল সফ্ট বা নরম কোমল ফাইবারের সুটকেস। মানব জাতির মতই নানা রকম চেহারা ও নানান সাজে সজ্জিত হয়ে সে দেখা দিল। সে দাঁড়াতেও পারে আবার শুয়েও থাকতে পারে। মানুষ যেমন বন্ধুদের সাথে হাত ধরাধরি করে হাঁটে, এই নতুন সুন্দর অভিজাত শ্রেনীর সুটকেসও তেমনি বোতাম টিপলেই হাত বাড়িয়ে মানুষের হাত ধরে এবং চাকা স্বরূপ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গড়গড়িয়ে মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। মোট বহনের কষ্ট লাঘব হয়। মানবকুল খুশিতে উপছে পড়ে, তুমিও তোমার নানান রঙের নানান ঢঙের লাবণ্য নিয়ে হাস্যে লাস্যে বিগলিত হয়ে মানবকুলের সব রকম সফরে সামিল হও।

সব চেয়ে গরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল আজকাল সুসজ্জিতা অতি আধুনিকা মহিলারা তাদের ফুটানিকা ডিব্বার বদলে মোটামোটি ছোটর ওপর চাকচিক্যময় তোমাকেই হাতে রাখে, কোলে বসায়। আর তোমার উদরে সফর সঙ্গী সুগন্ধী ফুলের নির্যাস, ওষ্ঠরঞ্জনী, মায়াদর্পণ, হাল্কা প্রসাধনী ও প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ পত্র।

সত্যি করে বলতো, তুমি তাতে পুলকিত হও না? শিহরিত হও না? অমলাকান্তের কাছে লজ্জা পেওনা। তোমার এই পরিবর্তন বা বিবর্তন অমলাকান্তকে উৎসাহিত করে, আমোদিত করে। তবে নির্জন অবসরে মনে হয় যতই তুমি দ্যাখনধারী হও না কেন আদতে তো তুমি সেই পোঁটলাই।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক এক শিক্ষকের স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য বোঁচকা বেঁধে অতি যত্ন করে পিঠে পুলি তৈরী করে নিয়ে এসে তাঁকে খাওয়ালেন। পরদিন তিনি আবার এসে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গুরুদেব, পিঠে কেমন লাগলো?'' রবীন্দ্রনাথ মজা করে বললেন, "লোহা কঠিন, পাথর কঠিন আর কঠিন ইষ্টক, / তাহার অধিক কঠিন কন্যা তোমার হাতের পিষ্টক।''